পঁয়ত্রিশ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

আশরাফ আহমেদ

এক সকালে গিয়ে দেখতে পান উইপোকা তাঁর পরীক্ষার খাতার স্তুপের নীচ থেকে খেয়ে খেয়ে একটি সুড়ং বানিয়ে ওপর পর্যন্ত চলে এসেছে। ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধে উইপোকার ওপর তাঁর ভীষণ রাগ হোল। তখন রাগটিকে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় রূপান্তরিত করে, উইপোকাগুলোকে ধরে, হামানদিস্তায় পিষে ফেললেন! পোকাগুলো তাদের শরীরের কোন প্রাণরসায়নিক দ্রব্য দিয়ে প্রিয় ছাত্রদের পরীক্ষার খাতাগুলো নষ্ট করে ফেলেছিল তা খুঁজতে লাগলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায়...

এখানে আসার আগেই শিক্ষক, পুরনো সহকর্মী, বন্ধু, সহপাঠী, এবং ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা এখনো শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের সাথে দেখা করার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলাম। তাঁরাও উৎসাহভরে উত্তর দিয়েছিলেন। আনোয়ার ভাই ফোনে বললেন সকাল এগারোটার দিকে গেলে সব শিক্ষককে একত্রে পাওয়া যাবে চায়ের আসরে। একদিন সকাল দশটায় কার্জন হল এলাকায় পৌঁছে পুরো চত্বরটা একা একা ঘুরে বেড়িয়ে "প্রাণরসায়ন ও অনুজীববিজ্ঞান" বিভাগের দালানটিতে ঢুকলাম। যদিও ফার্মেসি বিভাগ অন্যত্র চলে গেছে, অপেক্ষাকৃত নতুন জন্ম নেয়া ফার্মেসি ফ্যাকাল্টিটি এখনো দালানের নীচতলাটি দখল করে আছে। পরিচিত কেউ আছে কিনা খোঁজ নিতে ডিন ডঃ আ,ব,ম, ফারুকের নাম দেখলাম একটি দরোজার ওপর। ছাত্রজীবনে তিনি এক ক্লাশ নীচে থাকলেও আমার স্বল্পকালীন শিক্ষকতা জীবনে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব গভীর হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ডিনের অফিসের কাজ করতে তিনি এখানে বিকেলে কোন একসময়ে আসেন। দোতলায় উঠতে সিড়ির অর্ধেক পেরিয়ে বাঁক নেয়ার সময় বেশ কয়টা দামি কাগজের বিশাল ও রঙিন পোষ্টার চোখে পড়লো। একটি পোষ্টার ছিল কোন ব্যাঙ্ক বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে রচনা আহবানের প্রচারপত্র। পঁয়ত্রিশ বছর আগে এরকম একটি পোষ্টার পেলে আমরা তা দেয়াল থেকে তুলে নিয়ে নিজের ঘর সাজাতে চাইতাম!

দোতলায় উঠলে সিড়ির পাশে দেয়ালের নোটিস বোর্ডটি এতোই পরিচিত লাগলো যে এখানে নতুন পড়ার কিছু আছে বলে মনে হোলনা। দরোজা পেরিয়ে ভেতরের করিডোরে ঢুকে ডানের ঘরে ইশতিয়াক ভাই স্বাগত জানালেন। তিনি আমার এক ক্লাশ ওপরে ছিলেন এবং একই

ফজলুল হক হলের বাসিন্দা ছিলেন। এখানে বসে থাকতে থাকতেই আমার সহপাঠী ডঃ মামুনুর রশীদ চৌধুরি এসে ঢুকলেন। আমাকে দেখেই হৈ হৈ করে তাঁর অতি পরিচিত, উচ্চস্বরের হাসি দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি এখন বিভাগীয় চেয়ারম্যান। অনার্সে প্রথম হয়েছিলেন বলে এমএসসির ফল প্রকাশ হওয়ার আগেই তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন, আর আমি ও আনোয়ার ভাই যোগ দিয়েছিলাম একমাস পর, ১৯৭৫ সনের জানুয়ারির এক তারিখ। কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে তিনি চলে যান গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আর আমি যাই কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ে মনবুশো স্কলারশিপ নিয়ে। মামুন ও ইশতিয়াক ভাই আমাকে নিয়ে শিক্ষকদের চা-ঘরে (টি লাউঞ্জ) এসে ঢুকলেন। এখানেই দেখা হোল ডঃ সালেহিন কাদরি, ডঃ হাসিনা খান, ডঃ লায়লা নুর, ডঃ জেবা সেরাজ, ডঃ ইয়ারুল কবির, ডঃ শরিফ আখতারুজ্জামান, এবং ডঃ হোসাইন শেখর এর সাথে। এঁদের মধ্যে সালেহিন ভাই আমার তিন বছরের সিনিয়র এবং ফজলুল হক হলে আমার পাশের ঘরে থাকতেন; হাসিনা, লায়লা, জেবা ও ইয়ারুল কবিরকে আমি ছাত্র হিসেবে পেয়েছিলাম; আর শেষের দুজনের সাথে ইমেইলে পরিচয় ছিল। এঁরা ছাড়াও আরো কয়েকজন নবীন শিক্ষকের সংগেও পরিচয় হোল। সেদিনই আমার একবছর পরের ছাত্র এখন অধ্যাপক ডঃ খলিলুর রহমানের সাথেও দেখা হোল, এক সময়ে তিনি মৌলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন।

গদিওয়ালা চেয়ারে বসতে গিয়ে মনে পড়লো, পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমাদের কোন লাউঞ্জ ছিলনা আর আমার অফিসের কাঠের চেয়ারটিতে ছিল ছিদ্রওয়ালা বেতের পাটাতন। এই ধরণের চেয়ার গরমে আরামদায়ক হলেও কিছুক্ষণ বসে থাকলে পেছনে ও উরুতে বেতের ছাপটি অনেক্ষণ লেগে থেকে চুলকানির উদ্রেক করতো। সবার সাথে কথাবার্তা বলে জানতে পারলাম যে এই লাউঞ্জটি ছাড়াও প্রতিজন শিক্ষকের অফিস, এবং লেকচার থিয়েটার এখন সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। তাঁরা চাইছেন সবক'টি শ্রেণিকক্ষেও শীততাপ নিয়ন্ত্রক বসাতে। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে শুধু চেয়ারম্যানের অফিস এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ঘরটি ছাড়া কোথাও এই আরামদায়ক ব্যবস্থা ছিলনা। মামুন ও সালেহিন ভাই জানালেন, এখন সব শ্রেণিকক্ষেই ওপর থেকে বৈদ্যুতিন অভিক্ষেপ (ওভারহেড ইলেক্ট্রোনিক প্রজেকশণ) এর ব্যবস্থা থাকলেও অচিরেই তাঁরা শিক্ষাদানে অত্যাধুনিক ইন্টারেক্টিভ ইলেক্ট্রোনিক টিচিং ডিভাইস চালু করতে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় এর বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। বললাম, আমেরিকায় আমার কাজের যায়গায় আমরা এখনো ওভারহেড প্রোজেকশণ দিয়েই শিক্ষা ও সেমিনারের কাজ চালাই। সেদিক দিয়ে আপনারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন। তিনি ও মামুন আরো জানালেন যে, বহির্বিশ্বের সাথে সবগুলো শ্রেণিকক্ষ সহ পুরো বিল্ডিংটির ইন্টারনেট যোগাযোগ বেতার (ওয়ায়রলেস) এর আওতায় আনার কাজ এগিয়ে চলেছে। শুনে খুব ভাল লাগলো। তিরিশ বছর আগে মুখস্ত করা বিদ্যা উগড়ে দিয়ে, শুধুই কালো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে লিখে

হাত, মুখ ও সার্ট-কোটে সাদা চকের গুড়ো মেখে আমরা ক্লাশ থেকে বেরোতাম!

অধ্যাপক ইয়ারুল কবির এর অফিস কক্ষে যখন গল্প করছিলাম, তখন আনোয়ার ভাই (অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন) এসে ঢুকলেন। বললেন আজকাল বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে জড়িয়ে পড়ায় স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অন্যদের কথায় বুঝতে পারলাম এই ব্যস্ততা সত্বেও তিনি তাঁর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে কোন গাফিলতি করেননা বলে এখনো সুনাম বজায় রেখেছেন। আনোয়ার ভাই তাঁর গাড়িতে করে মামুন, ইশতিয়াক ভাই ও আমাকে খেলার মাঠের উল্টোদিকে "সেন্টার ফর এক্সিলেন্স (ইন সায়েন্স)" ভবনে নামিয়ে দিলেন। এই সেন্টারটি নতুন বানানো হয়েছে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে বলে শুনেছি। অধ্যাপক সালেহিন কাদরি এর প্রথম পরিচালক ছিলেন, বর্তমানে কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক আলতাফ হোসেন এর প্রধান। দোতলায় সুন্দর একটি ক্যাফেটারিয়া। সেখানে মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক ডঃ মোজাম্মেল হক ও অধ্যাপক ডঃ আনোয়ার হোসেন আমার টেবিলে এসে দেখা করে গেলেন বা দেখা হোল। সিরাজভাই আমার শিক্ষক স্বর্গীয় ডঃ আনোয়ারুল আজিম চৌধুরির কাছে নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাক্টেরিয়ার কাজ শিখতে আসতেন, পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। মোজাম্মেল বায়োকেমিষ্ট্রিতে আমার দুইবছর নীচে ছিল, পরে জাপানে গিয়ে আরো ঘনিষ্টতা হয়েছিল। আনোয়ার হোসেনকে বায়োকেমিষ্ট্রিতে আমি ছাত্র হিসেবে বছর দুয়েক পেয়েছিলাম, সে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান। সবাই তাঁদের বাসায় বা অফিসে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। মিনিট পাঁচেকের জন্যে শুধু অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের অনুরোধ রাখতে পেরেছিলাম। এই সময়ের মধ্যেই সে জানিয়েছিল যে আইসিডিডিআরবি'র সাথে কোলাবোরেশনে একটি বায়োসেফটি লেভেল-টু গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। সেজন্যে তার বিভাগে এখন নবীকরণ বা রিনোভেশন এর কাজ চলছে বলে সে আমাকে গবেষণাগারটি দেখাতে পারছেনা।

প্রাণরসায়ন বিভাগে ফিরে আসার পর সেদিন আড়াইটায় বিভাগের "একাডেমিক কমিটি"র মিটিং ছিল। এই মিটিংএ সাধারণতঃ বিভাগীয় শিক্ষা-কার্যক্রম, সিলেবাস, তালিকা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়ে থাকে। অধ্যাপক ইয়ারুল কবির বললেন, স্যার আজ আপনিও আসুন আমাদের সাথে। আমি রাজি হলাম না। আমার বাল্যবন্ধু ইয়াহিয়া বিকেল সাড়ে তিনটায় নিতে আসবে। কাজেই এখানে আরো একঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় তাঁর অফিসে একা রেখে যেতে দুঃখিত হলেও চেয়ারম্যান ডঃ মামুনুর রশীদকে চলে যেতে হোল। তবে যাওয়ার আগে আমার সুবিধার্থে ঘরের তাপমাত্রাটি আরো কমিয়ে, পছন্দের কফির ব্যাবস্থা করে, তাঁর কর্মচারিদেরকে আমার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। এভাবে একা বসে কফি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে 'আশরাফ কেমন আছ' বলে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এসে ঢুকলেন। আমি ছাত্র অবস্থায় তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, পরে বিভাগের শিক্ষক হয়েছিলেন এবং তারো অনেক পরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। বললেন, তুমি এসেছো শুনে দেখতে এলাম। আমিতো একাডেমিক কমিটির মিটিং এ আছি আর তুমিতো আমাদেরই একজন, কাজেই ওখানেই এসে বস। বললাম, স্যার আপনাকে ধন্যবাদ, অন্যেরাও তাই চেয়েছিল কিন্তু এটি যেহেতু আপনাদের অফিসিয়াল মিটিং, আপন হয়েও সেখানে বহিরাগত কারো থাকাটা ঠিক হবেনা বলে এখানে বসে আছি। আর ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে মনে মনে বললাম, এই দীর্ঘ বত্রিশ বছর পরও

আপনারা আমার প্রতি যে আস্থা দেখাচ্ছেন তাতে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই!

একদিন ঘুরে ঘুরে ইশতিয়াক ভাই বিভাগটি দেখালেন। আগের আড়াইতলা ভবনটি ভেংগে নতুন দোতলা করে বানানো হয়েছে। আগের প্রধান ভবনের তিনতলার লেকচার থিয়েটারটির স্থলে এই নতুন ভবনের দোতলাতে করা হয়েছে "প্রফেসর কামালউদ্দিন আহমেদ লেকচার গ্যালারি"। (প্রফেসার কামালউদ্দিন আহমেদের একক প্রচেষ্টায় ১৯৫৭ সনে এই "প্রাণরসায়ন" বিভাগের জন্ম হয়েছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সমতা রেখে বছর পনের আগে "এবং অণুজীববিজ্ঞান" যোগ করে বিভাগের নামটি পরিবর্তন করা হয়েছিল।) গ্যালারির মঞ্চ এলাকা থেকে ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে যাওয়ায় পেছন থেকে দেখতে দর্শকদের কোন অসুবিধা হয়না, তবে দুইপাশে হাঁটার যায়গা রেখে মেঝেতে প্রোথিত কাঠের

বাক্সের মত বেঞ্চি ও টেবিলগুলো আমার কাছে বেমানান ঠেকেছে। আগে দোতালার কেমিক্যাল ষ্টোর রুমটি এখন নীচতলায় চলে গেছে। আলোকিত ও খোলামেলা এই ঘরটিতে ঢুকতে এখন আর কোন ভুতুড়ে অনুভুতির সৃষ্টি হয়না। আগে এনিম্যাল হাউজের কেয়ারটেকার স্বর্গীয় গোলাম হোসেন ভাইয়ের ছেলে এখন ষ্টোরের দায়িত্বে আছেন। ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া, সন্তোশদা, সুরেশদা, আবু তালেব, পুরনো কোন চেহারাই নজরে এলোনা। ইশতিয়াক ভাই বললেন, প্রাইভেট ডোনেশন পেলে বিভাগটিকে আরো উন্নত করার পরিকল্পনা তাঁদের আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার পর অনেকবার অনুরোধ আসলেও কখনো সেখানে সেমিনার দেয়া সম্ভব হয়নি বিভিন্ন কারণে। কখনো হয়তো হরতাল ছিল, কখনো আমার স্লাইড প্রস্তুত ছিলনা, কখনো হয়তো বেশি শ্রোতা সমাগম হবেনা সে ভয় ছিল, আবার কখনো হয়তো সেমিনার দেয়ার জন্যে আমেরিকা থেকে আমার অনুমতি ছিলনা। আর দুবার অনুমতি থাকা সত্বেও এবং ঢাকায় অনেক আগে থেকে ঘোষণা দেয়ার পরও, বাংলাদেশে এবং ভারতে রাজনৈতিক-সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ভয়ে আমেরিকান সরকার আমার যাত্রার প্রাক্কালে তা স্থগিত করতে বাধ্য করেছিল। সেই অপরাধ লাঘবের জন্যে এবার সেমিনার দিতে চাই বলে প্রাণরসায়ন বিভাগে আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী বন্ধু-সহপাঠী, অধ্যাপক ডঃ মামুনুর রশীদ চৌধুরির উপস্থাপনায় এবং বিভাগের প্রায় সব জ্যেষ্ঠ্য শিক্ষক ও স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে একদিন সেই অপরাধও খণ্ডন করলাম। সেমিনার শেষে কয়েকজন ছাত্র, দুজন নবীন শিক্ষক এবং অধ্যাপক সালেহিন কাদরির প্রশ্ন এবং প্রাণবন্ত আলোচনায় মুগ্ধ হয়েছি।

অনেকের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম বিভাগে এখন মাত্র দুইজন সিনিয়র শিক্ষকের উন্নতমানের গবেষণা-প্রকল্প ও কার্যক্রম রয়েছে। এঁরা হলেন অধ্যাপক হাসিনা খান ও অধ্যাপক জেবা সেরাজ। প্রথমজন 'জুট জেনোম' গবেষণায় সুনাম অর্জন করেছেন আর দ্বিতীয়জন 'লবনাক্ত পানিতে ধানচাষ' গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা নিজেদের ল্যাব ঘুরিয়ে দেখানোর সময় লক্ষ্য করলাম, এই দুজনেরই পিএইচডি গবেষণার ছাত্রসহ বিশাল গবেষক দল রয়েছে। গবেষণার কাজ শুরু করতে যাওয়া আরেকজন, অধ্যাপক ইয়ারুল কবির আমাকে ডেকে তাঁর কাজের পরামর্শ করলেন। নিজের বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব না থাকলেও এই তিনজনকেই এখানে আমার স্বল্পকালীন শিক্ষকতা জীবনে ছাত্র হিসেবে পেয়েছিলাম বলে এক প্রকার আত্মতুষ্টি অনুভব করলাম। এঁরা ছাড়াও অধ্যাপক শেখর, অধ্যাপক হাওলাদার, ও অধ্যাপক নূরন্নবীর নিজস্ব গবেষণা প্রকল্প রয়েছে বলে শুনেছি। যদিও এমন আহামরি গোছের কিছু ছিলনা, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এখানে আমার ছাত্র-শিক্ষকতার সময় সব সিনিয়র শিক্ষকেরই নিজস্ব গবেষণাগার ও প্রকল্প ছিল। একজন

জানালেন, এখানে শিক্ষকতার পর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্যে অনেকেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় চাকুরি করেন বলে গবেষণার সময় বের করতে পারেন না। তবে নিজেরা গবেষণাগার চালাতে না পারলেও তাঁদের অনেকেই আইসিডিডিআরবি'র বিজ্ঞানীদের সহযোগীতায় স্নাতকোত্তোর ছাত্রদের এডভাইজারের দায়িত্ব পালন করেন বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

যে তিনদিন এই বিভাগে এসেছি, প্রতিবারই সব শিক্ষকদের সাথে লোভনীয় সব নাশতা বা স্ন্যাকস আমারও সামনে এসেছে। আবার দুপুরে তাঁরা লাঞ্চও খাইয়েছেন। সিংগারা, জিভে জল আসা কয়েক ধরণের মিষ্টি, প্যাষ্ট্রি, প্যাটিজ, কেক, স্যাণ্ডউইচ, কলা, কমলা, ঠাণ্ডা পানীয়, পছন্দমত চা বা কফি দিয়ে তাঁরা নিজেদেরকে ও আমাকে আপ্যায়ন করেছেন। দুই দিন "জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড বায়োটেকনোলোজি" বিভাগেও এর কোন ব্যতিক্রম ছিলনা। আঁচ করলাম আপ্যায়নের এই প্রাচুর্য একদিন বিশেষ উপলক্ষে হলেও তা উল্লেখ করার মত কোন বিষয় না। বত্রিশ বছর আগের কথা মনে পড়লো। এগারোটার দিকে আমার বা জুনিয়র অন্য কোন শিক্ষকের ঘরে সিনিয়র শিক্ষকদের কয়েকজন দেখা দিতেন, শুধু এককাপ চায়ের সাথে একটি সিগ্রেট পাওয়া যাবে সেই আশায়! প্রায় কুড়ি বছর আগে যখন এসেছিলাম, শিক্ষকরা তখন তিনতলার অনার্স প্র্যাক্টিক্যাল ল্যাবের এককোণে জড়ো হয়ে চায়ের সাথে একটিমাত্র সিংগারা দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। দেশের সবার সাথে সাথে আমাদের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা যে আগের চেয়ে দিনে দিনে অনেক ভালোর দিকে এগোচ্ছে সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহই রইলোনা।

"সেন্টার ফর এক্সিলেন্স (ইন সায়েন্স)" ভবনের ক্যাফেটারিয়ায় একদিন পুরনো ছাত্রদের সাথে খাওয়ার টেবিলে তিনজন এসে অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে নিজেদের পরিচয় দিলেন। এঁরা সবাই 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড বায়োটেকনোলোজি" নামে একটি নতুন বিভাগের শিক্ষক। অধ্যাপক ডঃ আফতাব উদ্দিন চেয়ারম্যান, আর মাহবুবুর রশীদ এবং মুশতাক ইবনে আয়ুব নামে দুজন নবীন শিক্ষক। প্রাণরসায়ন বিভাগের আমার সহপাঠী অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন শুরু করার পর, প্রাণরসায়নেরই অধ্যাপক হাসিনা খানের

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির এই নতুন বিভাগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের কাছে এই বিভাগটির গুরুত্ব, আকর্ষণ ও চাহিদা সর্বাধিক! অত্যন্ত বিনয়ী চেয়ারম্যান আফতাব উদ্দিন অনেকটা করজোরে অনুরোধ করলেন, আমি কয়েক মিনিটের জন্য হলেও যেন যাই, তিনি তাঁর বিভাগটি আমাকে ঘুরিয়ে দেখাতে চান। এঁদের কারো সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় না থাকা সত্বেও নিজ থেকেই পরিচিত হতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রবল উৎসাহ আমাকে দারুণভাবে পরিতুষ্ট করলো। ফলে ঢাকায় আমার প্রতিটি দিন বিভিন্ন কর্মসূচীতে ঠাসা থাকা সত্বেও শুধু একদিন নয়, দুইদিন স্বল্প সময়ের জন্যে তাঁদের সেই বিভাগে আমার যেতে হয়েছিল।

প্রথম পরিচয়ের মতো "জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড বায়োটেকনোলোজি" বিভাগে আসতেই অধ্যাপক আফতাবউদ্দিন আবার অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর প্রশস্ত অফিস কক্ষে সহকর্মীরা এসে জড়ো হলেন। আমার দুইদিনের আগমনে যাঁদের সাথে পরিচয় হোল, তাঁরা হলেন অধ্যাপক ডঃ আনোয়ারুল আজিম আখন্দ, সুপারনিউমারি প্রফেসর রফিকুর রহমান (তিনি প্রাণরসায়ন বিভাগে আমার ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার ঠিক আগে শিক্ষক হয়ে যোগ দিয়েছিলেন), সহযোগী অধ্যাপক ডঃ জেসমিন, সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোঃ নাজমুল আহসান, সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সাবিনা ইয়াসমিন, সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নাজমুল আহসান, প্রভাষক রিয়াজুল হোসেন, এসিআই ফারমাসিউটিক্যালস এর কর্মকর্তা এবং অতিথি শিক্ষক মিঃ কমলেশ হালদার, যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক এবং অতিথি ফুলব্রাইট স্কলার ডঃ রুহুল হক গোলাম কুদ্দুস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ নারায়ণ রায়, এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বার অধ্যাপক এমরান কবির চৌধুরি। দুইদিনই বিভিন্ন ফল, নোনতা, মিষ্টি, এবং ঠাণ্ডা ও গরম পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করলেন।

প্রথমদিন সবাই গোল হয়ে বসে বিভাগের শিক্ষা, কার্যক্রম, শ্রেণিকক্ষ, পাঠাগার, এবং তাঁদের নিজস্ব গবেষণার বিষয়বস্তু, ফলাফল ও সমস্যা খুলে বললেন। নিজের গবেষণার বিষয়বস্তুর কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক আফতাবউদ্দিন জানালেন যে, বিভাগের এই নতুন দালান তৈরি হওয়ার আগে তাঁরা অনেক ক'টি বছর কার্জন হলের একটি বিজ্ঞান গুদামঘরে (সাইন্স ওয়ার্কশপ) অফিস করতেন ও ক্লাশ নিতেন। তখন এক সকালে গিয়ে দেখতে পান উইপোকা তাঁর পরীক্ষার খাতার স্তুপের নীচ থেকে খেয়ে খেয়ে একটি সুড়ং বানিয়ে ওপর পর্যন্ত চলে এসেছে। ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধে উইপোকার ওপর তাঁর ভীষণ রাগ হোল (লেখকের মন্তব্য)। তখন রাগটিকে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় রূপান্তরিত করে, উইপোকাগুলোকে ধরে, হামানদিস্তায় পিষে ফেললেন! পোকাগুলো তাদের শরীরের কোন প্রাণরসায়নিক দ্রব্য দিয়ে প্রিয় ছাত্রদের পরীক্ষার খাতাগুলো নষ্ট করে ফেলেছিল তা খুঁজতে লাগলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় দেখতে পেলেন যে সেই উইপোকা-পিষানো রসে একটি 'জাইইলানেজ' নামের 'এনজাইম' বা অনুঘটক রয়েছে এবং তা দিয়েই তারা কাগজ গুড়ো করে খেয়ে ফেলেছিল। তখন পোকা-পিষানো রস থেকে অনুঘটকটিকে পরিশোধিত করে সহজেই তাঁর এবং ছাত্রদের গবেষণার বিষয়বস্তুও বানিয়ে ফেললেন। পুরো ঘটনাটি শুনে আমি খুবই চমৎকৃত হলাম। উন্নয়নশীল একটি উঠতি-দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রায়োগিক (এপ্লায়েড) বিজ্ঞান গবেষণায় মনযোগী হয়ে তিনি সঠিক পথে এগোচ্ছেন দেখে আমি ভীষণ আশান্বিতও হলাম। ডঃ জেসমিন একটি প্রাইভেট কোম্পানীর অর্থায়নে তাঁর বায়োইনফরমেটিক্স ল্যাব প্রতিষ্ঠার কথা খুব আগ্রহভরে বর্ণনা করলেন। পরে ল্যাবটি দেখাতেও নিয়ে গেলেন।

চেয়ারম্যানের ঘরে ফিরে এলে তাঁরা বললেন, আপনি দয়া করে যদি আমাদের কোন উপদেশ দিয়ে যান তবে আমরা খুব খুশি হব। বললাম, উপদেশ আমি এমনিতেই দিতে পারিনা, তার ওপর আপনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের সবচেয়ে নামকরা এই বিভাগটি চালাচ্ছেন, আপনাদের কোন উপদেশ দেয়ারতো কোন প্রশ্নই আসেনা। একথা শুনে আরো বিনয়ের সুরে বললেন, তা'হলে আপনার যা মনে আসে তা'ই বলুন, তাতেই আমাদের উপকার হবে ও আমরা খুব খুশি হব। আমার তখন চোখে পানি চলে আসার জোগাড়! বত্রিশ বছর থেকে আমি দেশ ছাড়া। আমেরিকায় কর্মসূত্রে নিজস্ব ক্ষুদ্র গবেষণা-গণ্ডির কিছু বিজ্ঞানী ও সামাজিকভাবে হাতেগোনা ক'জন বন্ধুর বাইরে কেউই আমাকে তেমন চেনেনা। অথচ স্বদেশের পূর্ব পরিচয়হীন এই নবীন বিজ্ঞানীরা কি উৎসাহভরে আমার কথা শুনতে চাইছে! কি আমার পরিচয়? দিনে দিনে ব্যস্ততর এই শহরে নিকট-বন্ধুর সাথে সম্পর্কও যেখানে লাভ-ক্ষতি দিয়ে বিচার হয়, সেখানে সদ্য পরিচিত বিনয়ী এই ক'জন শিক্ষক কিসের আশায় উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে আমার সাথে সময় কাটাতে চাইছেন? এঁদের সাথে আমার কিসের সম্পর্ক? কতক্ষণ মৌন থেকে অনেক কষ্টে বুকের ভেতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে আসা ভাবোচ্ছ্বাসকে সামলে নিয়ে, তাঁদের নির্মল সান্নিধ্যে আরো কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

প্রথমদিন চলে আসার আগে সব শিক্ষকরা এক হয়ে বললেন, স্যার এখানকার (রোগ সংক্রামিত হওয়ার ভয়ে) খাবারে বাছবিচার করে করে এবং ভ্যাপসা আবহাওয়ায় আপনি ক্লান্ত, এবং আপনার হাতে সময় কম, তা আমরা জানি। বললেন তবুও যদি আমি যদি কষ্ট করে আরেকদিন এসে একটি সেমিনার দেই তাতে তাঁরা নিজেরা এবং ছাত্ররা খুব উপকৃত হবে। এঁদের প্রায় কেউই ক'দিন আগে প্রাণরসায়ন বিভাগে দেয়া আমার সেমিনারে উপস্থিত থাকতে পারেননি। 'ঢাকার লোকজন সেমিনার শুনতে বেশি আগ্রহী নন' প্রবাসী বাঙালিদের মাঝে চালু এই কথাটি ভুল প্রমাণিত হওয়ায় মনে মনে লজ্জিত হলাম। আমি তাঁদের সেই অনুরোধে রাজি হয়ে আরো একদিন এখানে এসেছিলাম। এই বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকরা আমাকে যে বিনয়, শিষ্টাচার ও সম্মান দেখিয়েছে তাতে আমি সত্যিই ভীষণ অভিভূত হয়েছি!

পৃথিবীর সব বিশ্ববিদ্যালয়ই নতুন কিছু জানার, গবেষণার ও আবিষ্কারের জ্ঞানমন্দির হিসেবে স্বীকৃত। তারই ধারাবাহিকতায় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই সৃষ্টি করেছে অধ্যাপক সত্যেন বোসের মত বিজ্ঞানী। তাঁর বর্ণিত অনুর অদৃশ্য কণা "বোসোন" আজ প্রায় একশত বছর পরও পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে। অন্য সবগুলোর কথা জানিনা তবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির অনেক বিভাগই এখনো উন্নতমানের শিক্ষাদান কার্যক্রম চালু রাখতে সক্ষম হলেও, আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান পৃথিবীর সেরা পাঁচশত বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় তো নেইই, এশিয়ার সেরা একশতটির মাঝেও নেই, স্থান হয়েছে শুধু দক্ষিণ এশিয়ার সেরা, তাও সাইত্রিশ নম্বরে! প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শোচনীয় অবস্থার মাঝেও শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মান উন্নয়নে প্রাণরসায়ন বিভাগ, মাক্রোবায়োলজি বিভাগ, এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড বায়োটেকনোলোজি বিভাগের শিক্ষক-বিজ্ঞানীদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় দেখে গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা নিয়ে ফিরে এলাম।

১০ই জুন, ২০১২
মেরিল্যান্ড, আমেরিকা